তথ্যপ্রযুক্তির ৫৭ ধারা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অপরাধের ধরন যেমন বদলেছে, তেমনি বদলেছে অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমও। তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেগুলোকে দণ্ডবিধিতে তথ্যপ্রযুক্তি ও সাইবারক্রাইম আইনের আওতায় আনা হয়েছে, যা তথ্যপ্রযুক্তি আইন হিসেবে পরিচিত।

সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি ও সাইবারক্রাইম আইনের কঠোরতায় এক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেটে জনগণের মতপ্রকাশে বাধাদানকে 'অসাংবিধানিক' বলে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয়ার পর ফের আলোচনায় এসেছে ২০১৩ সালে সংশোধিত বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইন।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে ২০০০ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ ও ৬৬ক ধারার সাথে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারার মিল রয়েছে। উন্নত বিশ্বে যখন ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হাত দেয়া যাবে না বলে জোরালো দাবি উঠেছে, গুগল ও ফেসবুক যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে এ বিষয়ে আরও নমনীয় হতে বলেছে, তখন বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ৫৭ ধারার মতো আরও কঠোর আইন করে মানুষের মুক্তচিন্তা বন্দী করে রেখেছে।

বাতিল হয়ে যাওয়া ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ (এ) ধারায় কোনো ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য, ছবি বা ভিডিও পোস্ট করলে তাকে গ্রেফতার করা হতো। শুধু তাই নয়, ওই পোস্টে কেউ লাইক দিলেও গ্রেফতারের শিকার হতেন। আইনে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আপত্তিকর কিছু পোস্ট করলে অভিযুক্তকে সাথে সাথে গ্রেফতার করা হতো এবং দোষ প্রমাণ হলে অর্থদণ্ডসহ কমপক্ষে তিন বছরের কারাবাস দিত।

আবার অপরদিকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ (১) ধারায়, 'কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পরলে বা দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার মাধ্যমে মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহলে এ কাজ হবে একটি অপরাধ।'

বিধান অনুযায়ী এ অপরাধে ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং কমপক্ষে সাত বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইন ও শাস্তির বিধান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ভারতের আইনের চেয়ে বাংলাদেশের আইনটি অনেক কঠোর করা হয়েছে। ২০০৬ সালে যখন তথ্যপ্রযুক্তির আইন করা হয়, তখন সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছর কারাদণ্ড। ২০১৩ সালে তা সংশোধন করে শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয়।

আমি মনে করি, সব ধরনের অপরাধেরই বিচার হওয়া উচিত তা সে ফৌজদারিই হোক বা তথ্যপ্রযুক্তি ও সাইবারক্রাইমসংশ্লিষ্ট হোক। তবে তা কোনোভাবে অযৌক্তিক ও হয়রানিমূলক হোক তা চাই না। সেই সাথে এও প্রত্যাশা করি না যে কোনো আইনেরই অপব্যবহারের সুযোগ থাকুক। দেশ ও সমাজের রীতিনীতি পরিপন্থী যেকোনো কর্মকাণ্ডকে আমি দৃঢ়ভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করি। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করে বিভিন্ন বয়েসী নারীকে বিশেষ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদেরকে হয়রানি বা লাঞ্ছিত করা হলে তা কঠিন দণ্ডবিধির মাধ্যমেই দমন করা হোক। এখানে আইনের কোনো ধরনের দুর্বলতা বা নমনীয়তা থাকা উচিত নয়, হোক না তা সমালোচিত।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কেননা, এখানে রক্ষকই ভক্ষক। অর্থাৎ বাংলাদেশের পুলিশ। বাংলাদেশের পুলিশের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের খবরাখবর আমরা প্রায় সময় শুনে থাকি। ২০১৩ সালের সংশোধিত তথ্যপ্রযুক্তি আইনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরাধ জামিন অযোগ্য করা হয়। তাছাড়া আগে মামলা করার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। এখন তারও দরকার নেই। অপরাধ আমলে নিয়ে পুলিশ শুধু মামলা নয়, অভিযুক্তকে সাথে সাথে গ্রেফতারও করতে পারবে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত মামলার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি রয়েছে এ ক্ষেত্রে। সন্দেহের বশে পরোয়ানা ছাড়া পাইকারি গ্রেফতারের হাতিয়ার হিসেবে দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার মতো শেষ পর্যন্ত এই আইনটিও কুখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন তথ্যপ্রযুক্তি আইন সম্পর্কে তেমনভাবে প্রশিক্ষিত নয়। এর ফলে পুলিশের মধ্যেও এর অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। প্রয়োজনে পুলিশকে এ আইন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দেয়া উচিত যাতে তারা এর অপব্যবহার করতে না পারে।

শাহজাহান মিঞা
মিরপুর, ঢাকা।

তথ্যপ্রযুক্তিতে পৃষ্ঠপোষকতা চাই

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে খেলাধুলা, নাচ, গান প্রভৃতিতে তরুণ-তরুণীসহ বিভিন্ন বয়েসী প্রতিভাবানদের উৎসাহ দিতে অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকে, যা প্রায় প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন, মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার, ক্ষুদে গানরাজ, ক্লোজআপ ওয়ান–তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ, চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ ইত্যাদি। লক্ষণীয়, এসব অনুষ্ঠানে বিজয়ীদেরকে বিরাট অঙ্কের অর্থ পুরস্কার দেয়াসহ নানা ধরনের অফার থাকে। শুধু তাই নয়, এসব অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও কখনও হতে দেখা যায় না। এ কথা সত্য, দেশের প্রতিভা বিকাশের জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কের জন্ম দেয়। তারপরও আমি বলব, এসব অনুষ্ঠান দেশের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি প্রকৃত প্রতিভা অনুসন্ধানে অনেক বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

লক্ষণীয়, বিজ্ঞানে ধারক ও বাহক হলো গণিত। তাই সারা বিশ্বেই গণিতে প্রতিভা বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন গৃহীত হয়, তেমনি পৃষ্ঠপোষকও পাওয়া যায় প্রচুর, যা বাংলাদেশে দেখা যায় না। তবে গত কয়েক বছর ধরে দেশে গণিতে উৎসাহ-প্রেরণা দিতে গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজিত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে খুব সামান্য কিছু পৃষ্ঠপোষকের দেখা পাওয়া যায়, যা দেশে গণিতে প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি উৎসাহ-প্রেরণা জোগাবে। লক্ষণীয়, ইতোমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের মেধাবীরা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। বয়ে আনতে সক্ষম হয় যেমন আন্তর্জাতিক সুনাম, তেমনি বিশ্বদরবারে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের পরিচিতিও তুলে ধরতে সক্ষম হয়, যা কোনো খেলাধুলায় বা অন্য কোনো সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়নি।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের যাত্রা খুব বেশিদিনের নয়। তরপরও এ সফলতা বিশ্বের অনেক দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে নাচ, গান, খেলাধুলার মতো তথ্যপ্রযুক্তিতে উৎসাহ-প্রেরণা দিতে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। অথচ তথ্যপ্রযুক্তিই হবে ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি।

সুতরাং, আমাদের প্রত্যাশা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নাচ, গান প্রভৃতির মতো গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে পৃষ্ঠপোষতা করবে, যাতে এ ক্ষেত্রটি আরও এগিয়ে যাবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে যে দেশ যত বেশি এগিয়ে থাকবে, সে দেশ তত উন্নত ও সভ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলো সমভাবে নাচ-গানের মতো গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

শাহ আলম
কলাবাগান, ঢাকা।